ধীনতার আটচল্লিশ বছর পার হতে চলছে, বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে যে কেউ বলবে, এই দেশ আর দরিদ্রতাকে ভয় পায় না। উত্তরের মঙ্গা কিংবা দক্ষিণের অশান্ত সাগরে ডরে না। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জন্ম নেয়া ১৭ কোটির এই দেশ এক খন্ড সোনা। অবকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে শুরু করে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে প্রশংসনীয়ভাবে এগিয়ে গিয়েছে।

এটা বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রভাব। বাংলাদেশে অর্থনীতিতে বড় ধরনের জ্বালানি দিচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। এই রেমিট্যান্সের সিংহভাগই আসছে আমাদের শ্রমিকদের কাছ থেকে।

এইসব সুখের খবর থাকার পরও মন্দ লাগার অনেক কারণ দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের দেশের বৃহৎ একটি অংশ আজ চাকরিবিহীন। এই বৃহৎ অংশটি আর কেউ নয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পাস করে আসা বন্ধুরা। শিক্ষিত এই কর্মক্ষম যুবকদের চাকরির জন্য হাহাকার দেখে হৃদয়ের ভিতর মাঝেমধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। চাকরির পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে তারা আজ ক্লান্ত। এই ক্লান্তি আমাদের প্রশান্তির বার্তা বহন করে না। আমাদের দেশে যে পরিমাণ যুবশক্তি সিস্টেম লসের কবলে পড়েছে তা বিশ্বের খুব কম দেশেই আছে যারা এই শক্তিকে প্রয়োগিক দিকে নিয়ে যায়নি।

নারীরা কোথায় নিরাপদ?

আমান আল মাহ্‌মুদ

আজ থেকে শত বছর পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে নারীদের অবস্থা ছিল চরম শোচনীয়।

কিন্তু আমরা তা পারছি না। পারছি না বলে স্বাধীনতার পর যে গতিতে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে কয়েকগুণ মন্থরগতি আমাদের ওপর ভর করেছে।

প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন আমাদের এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগাতে পারছি না? কেন তারা আজ বছরের পর বছর চাকরির পেছনে চলতে গিয়ে নিজেদের মূল্যবান সময়টুকু খেয়ে ফেলছে?

কারণ হলো, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা কিছুটা হলেও আমাদের জীবনমুখী শিক্ষা হচ্ছে না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পাস করার পরও আমাদের কর্মক্ষেত্র থাকছে অদক্ষতায় ভরা।

তাহলে কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রদান করছে না? হ্যাঁ, করছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যা শিখছি তা বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখায় না।

তাই সিলেবাসের কলোবরে আমরা অনেক এগিয়ে রয়েছি। এটি শুধু আমার কথা নয়, দেশের বাইরে যারা পড়াশোনা করতে আসে তারা সবাই এক বাক্যে তা স্বীকার করবে।

তাহলে গলদটা কোথায়? হ্যাঁ, গলদ তো স্পষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েট তৈরির কারখানা হয়ে উঠছে। এই দেশে চল্লিশের কাছাকাছি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

ও শতাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থাকার পরও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞান তৈরি করতে পারছি না। আমরা কেবল অন্যদের জ্ঞান শোষণ করে চলছি কিন্তু নিজেদের জ্ঞান প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই।

যে কোন দেশের উন্নয়নের মূল রহস্য সেই দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয় কতটা গবেষণায় এগিয়ে। সেই দেশে জ্ঞান তৈরির খনি হয়ে যায়। আর গবেষণার মধ্যে দিয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়। শিক্ষাটা হয়ে ওঠে বাস্তবমুখী।

তাই দেশের উচ্চ শিক্ষার মানদন্ড নিরুপণ হয় সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান দেখে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু পঠন-পাঠনে এগিয়ে থাকলেই চলে না, এদের প্রভাব বিশ্বাঙ্গনে কতটুকু তা দেখার জন্য ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের মূল্যায়ন করার প্রয়োজন পড়ে না; বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দখলদারিত্ব কতটুকু তা দেখেই যে কেউ বলে দিতে পারে ওমুক দেশের তমুক বিশ্ববিদ্যালয় ভালো কি মন্দ।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করার পর যখন বিদেশের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আবেদন করা হয়, তখন একটা শিক্ষার্থীকে প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় তার পূর্বের

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাঙ্গনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। অর্থাৎ একটি শিক্ষার্থী ভালো ফলাফলের চেয়ে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মান কেমন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচিত হয়।

যে শিক্ষার্থী বাংলাদেশের সেরা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করলো, তাকে তার বিশ্ববিদ্যালয়কে চেনাতে হলে তার যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। ঠিক তাই, দেশের বাহিরে আমাদের দেশের যেসব ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে, মূলত তাদের ভালো কাজের বিনিময়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিচয় মিলছে বিশ্ব দরবারে। অথচ বিষয়টা হওয়ার কথা ছিল উল্টো। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান দেখে একটি শিক্ষার্থী কেমন হবে, তা আঁচ করতে পারে বাইরের দেশের অধ্যাপকগণ।

এবার আসা যাক গবেষণা কেন প্রয়োজন? এইসব প্রশ্নের সহজ কোন উত্তর নেই। ধরুন আপনি ভাত খেয়েছেন কিন্তু পানি খেলেন না তাহলে কি সেই ভাত আপনার দেহে কাজে দিবে? যদি না দেয় তাহলে প্রচলিত শিক্ষার বিষয়টাও এইভাবে কল্পনা করা যেতে পারে।

বিশেষ করে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য তা আবশ্যিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৌলিক গবেষণার ফল দীর্ঘমেয়াদি। আজকের কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছিল ১৮৩৩ সালে কিন্তু এর ব্যাপকতা পাচ্ছি কয়েক দশক ধরে, বংশগতির যে খুঁটি ধরা হয়

সেই ওয়াটশন ও ক্রিকের ডিএনএ মডেল এসেছিল ১৯৫৩ সালে কিন্তু তার ব্যাপকতা ছড়িছে দুই যুগ আগে। বিজ্ঞানের এই গবেষণাগুলোর পেছনে যদি আমাদের মূলধন ব্যয় না হয় তবে আমরা আজকের এই আধুনিক প্রজন্ম বলে দাবি করতে পারতাম না।

আজকে ক্যান্সারকে দূরারোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও আগামী এক দশকের মধ্যে এই চিকিৎসাও নিরাময়যোগ্য বলে চিকিৎসায় গবেষকরা বেশ শক্ত কণ্ঠে দাবি করছে। আমাদের কৃষি ব্যবস্থার যে বৈপ্লিকতা এসেছে তা কেবল গবেষকদের একনিষ্ঠ পরিশ্রম আর সাধনার ফসল।

এশিয়ার সব দেশ যে তরতর করে এগিয়ে চলছে তার প্রমাণ তাদের গবেষণা প্রবন্ধ। বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্স, নেচার, জ্যাকস, পলস আর পানাসে আজ চীন, জাপানে যে দৌরাত্ম্য দেখাচ্ছে তা থেকে অনায়াসে বলা যেতে পারে খুব শিগগির তারা বিশ্বে গবেষণা ক্ষেত্রে বড় ধরনের স্থান দখল করে নিতে যাচ্ছে। সম্প্রতি ভারত, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, তাইওয়ানের গবেষকরা যে ভেল্কিবাজি দেখাচ্ছেন তা রীতিমতো চোখ কপালে ওঠার মতো।

তবে মজার বিষয় হলো, হাজারও সীমাবদ্ধতার মধ্যে যখন সরকার আমাদের গবেষণাকে ত্বরান্বিত করার জন্য কিছু বরাদ্দ দিয়ে

থাকে কিংবা যন্ত্রপাতি ক্রয় করে দেয় তা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোটি টাকার কেনা যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করায় অকেজো হয়ে পড়ছে। বরাদ্দ সংকীর্ণতায় গবেষকরা এই যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করতে পারছেন না। এইগুলো যদি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চিত্র হয় তাহলে এর দ্বিগুণ সংখ্যায় যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা পরিসংখ্যানে আনা কঠিন।

তাই বলে আমরা আমাদের নিজস্ব অবস্থান তৈরি করবো না? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতির কারণে আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আসছে, দৈনন্দিন কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল হচ্ছে তা সমগ্র বিশ্ববাসী টের পাচ্ছে, কিন্তু আমরা কেন ঘুমন্ত?

বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রাণালয়ের ওয়েব সাইটে গিয়ে দেখতে পেলাম, তারা ৭টি প্রতিষ্ঠানকে লালন-পালন করেন। যেগুলোর গবেষণা নিবন্ধ খুঁজতে গিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বিসিএসআর, পারমাণবিক গবেষণা, ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে যে প্রজেক্ট দেখানো হয়েছে সেগুলো মূলত খাদ্য, বস্ত্র নিরাপত্তার টেস্ট। কীভাবে পুষ্টিগুণ বাড়ানো যাবে আর কীভাবে পুষ্টিগুণ পরীক্ষা করা যায় এর জন্য কয়েক লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়ার চিত্র পেয়েছি। মূলত সঠিক মূল্যায়নের অভাবে আমাদের দেশের মেধাবীরা দেশ

ত্যাগ করতে শুরু করেছে। আমরা যখন গবেষণায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছি তখন প্রতি বছর বিভিন্ন স্কলারশিপ দিয়ে বিশে^র বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীদের ডাকছে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো। গবেষণা করার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে।

উচ্চশিক্ষা নেয়ার নাম করে দেশ ত্যাগ করে কেন তারা ‘মেধা পাচারের স্বীকার হচ্ছে বাংলাদেশ। দেশের ধূলি কণায় নিজের শৈশব আর কৈশোর কেটেছে সেই দেশের প্রতি আবেগের সুতা কেন ক্ষয়মাণ হচ্ছে? তাদের কি সত্যিই বাংলাদেশ টানছে না? কেন এই ব্রেন ড্রেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব সহজে দেয়া যায়। বৈশ্বিক উন্মেষের কারণে ‘মেধা পাচার’-এর জন্য মূলত তিনটি অনুষঙ্গ প্রকট। প্রথমত, অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য, দ্বিতীয়ত মেধার সঠিক মূল্যায়ন পেতে আর তৃতীয়ত সামাজিক, পারিবারিক ও চিকিৎসার নিরাপত্তা।

একটি ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় পাস করে দেশে একটু চাকরি করলে যে পরিমাণ পরিশ্রমে বেতন আসবে ঠিক তার চেয়ে কম পরিশ্রমে দশগুণ আয় করার সুযোগ পাচ্ছে বিদেশে। দেশে মৃত্যু যেখানে ছেলে খেলা সেখানে নিজের নিরাপত্তা কিংবা পরিবারের নিরাপত্তার জন্য উন্নত দেশগুলোকে শিক্ষিত শ্রেণিরা বেছে নিচ্ছে। কারণ, সেইসব দেশগুলোতে মৃত্যু মানে

‘স্বাভাবিক শ্বাস ত্যাগ’। অকালে প্রাণ ঝড়ে পরার সম্ভবনা ক্ষীণ। রাজনৈতিক অক্ষ যেখানে সব জায়গায় ক্রমান্বয়ে বড় আকার ধারণ করছে, দুর্নীতির দুষ্টিপনায় বিবেক বর্জিত হয়ে যাচ্ছে সেখানে ফিরে যাওয়াকে নিজেদের সবচেয়ে বড় ভুল বলেই অনেক মেধাবী বাঙালিই মনে করছে। এছাড়া পর্যাপ্ত চিকিৎসা সহায়তা ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন পেতেই দেশবিমুখ তারা। পেশাগত উন্নয়নে ধোঁয়াশার বাতাস অনেকটাই ‘মেধাবীদের’ দেশে না ফিরতে পরোক্ষভাবে স্টিমুলেটেড করছে। গবেষণায় ‘বরাদ্দের’ অপ্রতুলতা, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক সুবিধা না পাওয়া অনেকটা কারণ হিসেবে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন হচ্ছে কেন তারা দেশে ফিরতে চায় না? কেন তারা বিশ^বিদ্যালয়ে ফিরতে চায় না? এ প্রশ্নগুলোর উত্তরও সহজভাবে পেয়েছি। বার্ষিক বরাদ্দের অপ্রতুলতা, শিক্ষকদের গবেষণাবিমুখ আচরণ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, বিশ্বে মান নিয়ে অনীহার অজুহাতই মুখ্য।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা করার সময় পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর এমিরেটাস অরুণ কুমার বসাকের সঙ্গে একবার কথা হয়েছিল তার গবেষণা প্রসঙ্গে। কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞানে দক্ষ এই বিজ্ঞানী আমাকে বলেছিলেন, আমরা কেন গবেষণা করব?

জগদীশচন্দ্র, কুদরাত-ই-খুদা, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামরা যে গবেষণা করে গেছেন, তা দিয়ে বিশ্বে হুলস্থুল বাধানো যেত। কিন্তু তাঁরা কেবল বাঙালি আর বাংলাদেশি হওয়ায় তাদের খ্যাতি, যশ, স্বীকৃতি বিশ্ব দেয়নি। আজ তারা যদি সাদা চামড়ার দেশে জন্মগ্রহণ করতো কিংবা থাকতো তাহলে দুই একটি নোবেল পুরস্কার আমাদের ঘরেও থাকতো।

এইগুলো কেবল দুই একটি উদাহরণ হলেও প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়গুলো আমাদের মস্তিষ্কে জায়গা নিয়ে ফেলছে। যে দেশের নাগরিকদের কর-এ (ট্যাক্সে) পড়াশোনা করলাম, যে দেশের বাতাস নিয়ে হৃৎপিন্ডকে বড় করলাম, শুধুমাত্র অর্থ আর সামাজিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে আমরা নিতান্ত স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়ে সেই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাচ্ছি। এইভাবে ‘ব্রেন ড্রেন’ হলে আমাদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারে ঢেকে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মালয়েশিয়ার আজকের যে উন্নতি তার পেছনে এর কারিগর মাহাথির মুহাম্মদ যে ভূমিকা রেখেছেন পিছনে যে রহস্যগুলো লুকিয়ে আছে তার মধ্যে সেই দেশের গবেষণাখাত বৃদ্ধি অন্যতম।

আমরা এখনো এই খাতে উদাসীন। আমরা মনে করছি না, এই জায়গায় হাত দেয়া আগে

প্রয়োজন। আমরা যতই অবকাঠামোগত উন্নয়নে ফিরি না কেন, জ্ঞান সৃষ্টি করতে না পারলে প্রযুক্তির রগরগে বিশ্বে আমাদের অবস্থান নিয়ে টানাপোড়েন দেখা দিতেই পারে। যেখানে সারা বিশ্ব নজর দিচ্ছে নিজ নিজ দেশের গবেষণায় সেখানে আমরা কেন পিছিয়ে পড়ছি? আমাদের দেশ যেভাবে আমলাতন্ত্রের কবলে খাবি খাচ্ছে, সেখানে জ্ঞান প্রয়োগের স্থান সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে- এটাই বাস্তবতা।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, অদম্য বাংলাদেশকে আরও বেশি গতি সঞ্চার করতে অবশ্যই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার প্রতি নজর দিতে হবে। এটা ছাড়া আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই সময় থাকতে সাবধান হতে হবে। শুধু সরকার নয়, এই দেশের বড় বড় কোম্পানিতে গবেষণার খাত তৈরি করতে হবে। তাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। আগামীর বাংলাদেশ হবে গবেষণাভিত্তিক নতুন বাংলাদেশ। আমাদের ভিতর লুকিয়ে থাকা শক্তিকে কেউ লুকিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা এগিয়ে যাব।

স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত